বাংলাদেশ থেকে শ্রম অভিবাসনের গতি-প্রকৃতি ২০১৬
সাফল্য ও চ্যালেঞ্জ

তাসনিম সিদ্দিকী
আনসারউদ্দিন আনাস
মোঃ আবুল বাসার
মোঃ মাহবুবুর রহমান
কিরান স্টিভেন্স

RMMRU

বাংলাদেশ থেকে শ্রম অভিবাসনের গতি-প্রকৃতি ২০১৬
সাফল্য ও চ্যালেঞ্জ

২৮ ডিসেম্বর ২০১৫

তাসনিম সিদ্দিকী
আনসারউদ্দিন আনাস
মোঃ আবুল বাসার
মোঃ মাহবুবুর রহমান
কিরান স্টিভেন্স

রেফিউজি এন্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিট (রামরু)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সূচনা

২০১৬ সালটি শ্রম অভিবাসনের প্রেক্ষাপটে বেশ চ্যালেঞ্জিং একটি বছর। এ বছর যুক্তরাজ্যের রক্ষনশীল দলের রাজনৈতিক প্রচারনায় অভিবাসনকে তাদের দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্য দায়ী করে ইউরোপীয় ইউনিয়ন হতে বের হয়ে আসার জন্য রেফারেন্ডাম জিতে। পুরো বছর জুড়েই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান পদপ্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প অভিবাসীদের বিরুদ্ধে প্রচারনা চালিয়ে জিতে আসেন। অন্যদিকে আবার শিশু আইলানের মৃতদেহ সমুদ্র পৃষ্ঠে পরে থাকায় যে গন আবেগ তৈরি হয় তা গৃহযুদ্ধের মুখে পতিত জনগোষ্ঠীর প্রতি এক ধরনের গন আবেগে জাগিয়ে দিয়েছিল তা সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ম্রীয়মান হতে শুরু করে। যার ফলশ্রুতিতে সিরীয় শরনার্থীদের জন্য সীমানা খুলে দিলে ঘটনা প্রবাহে জার্মানির চ্যান্সেলর আঙ্গেলা ম্যার্কেল তাঁর রাজনৈতিক জনসমর্থন হারাতে থাকেন।

এই পরিস্থিতিতে সামগ্রিক প্রেক্ষাপট নিয়ে আমরা যদি ২০১৬ সালের বাংলাদেশের অভিবাসন চিত্রের দিকে তাকাই তবে দেখা যাচ্ছে যে এ বছরে অভিবাসন ক্ষেত্রে বাংলাদেশর ব্যপক অর্জন রয়েছে। এই বছর সফলতার সাথে, অভিবাসন ও উন্নয়ন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন বাংলাদেশে আয়োজন হয়েছে। অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালে অভিবাসন কমপ্যাক্ট বিষয়ে যে আলোচনা হবে তাতে শরণার্থী সমস্যার পাশাপাশি শ্রম অভিবাসীর বিষয়টি যুক্ত করায় বাংলাদেশ সরকার একটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। একই বছরেই আবার মিয়ানমারের শাসকগোষ্ঠীর নিপীড়নের মুখে যখন রোহিঙ্গা শরণার্থীরা আশ্রয় প্রার্থী হয়েছে, আমাদের সরকার বিশ্ব রাজনীতিতে যে রক্ষণশীল মনোভাব লক্ষ্য করা গেছে ঠিক সেই মনোভাব থেকেই যেন রোহিঙ্গা শরণার্থীদের বিষয়টি দেখেছে। শ্রম অভিবাসনের ক্ষেত্রেও এ বছরটি বাংলাদেশের জন্য একটি সফল বছর। এবছরে গতবছরের তুলনায় শ্রম অভিবাসন বেড়েছে প্রায় ৩৫ শতাংশ। বেশ কিছু শ্রম গ্রহনকারি দেশ যেমন সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার এবং কুয়েত তাদের কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন এনেছে যা বাংলাদেশসহ সকল উৎসরাষ্ট্রের অভিবাসীদের জন্য ভালো ফলাফল তৈরি করবে। ২০১৬ সালে অভিবাসন খাতে সরকার, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং নাগরিক সমাজের সাফল্য এবং চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা করে এই প্রতিবেদন কিছু পদক্ষেপ উপস্থাপন করেছে; যা ২০১৭ সালে অভিবাসন খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে।

সেকশন-১

বাংলাদেশ থেকে শ্রম অভিবাসন ২০১৬

১.১ পরিসংখ্যান

২০১৬ সালে, জানুয়ারী থেকে ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৭,৪৯,২৪৯ জন বাংলাদেশি কর্মী উপসাগরীয় ও অন্যান্য আরব দেশ সহ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে অভিবাসন করেছে। এই ধারা অব্যাহত থাকলে এ বছর অভিবাসনের প্রবাহ গত বছরের তুলনায় প্রায় ৩৫% বৃদ্ধি পাবে। ২০১৫ সালে মোট ৫,৫৫,৮৮১ জন কর্মী বাংলাদেশ থেকে বিদেশে অভিবাসন করেছে। ২০১৩ সালে মোট ৪০৯,২৫৩ জন কর্মী কর্মসংস্থানের জন্য বিদেশে যান। ২০১৪ সালে মোট ৪,২৫,৬৮৪ জন কর্মী কর্মসংস্থানের জন্য বিদেশে গেছেন। সেক্ষেত্রে ৭ লক্ষাধিক কর্মীর অভিবাসন সত্যিই বাংলাদেশের অভিবাসন খাতে একটি ব্যাপক সাফল্য।

বিএমইটির তথ্য ভান্ডার হতে আমরা বলতে পারি যে, ১৯৭৬ থেকে ২০১৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ১ কোটির কাছাকাছি লোক কর্মসংস্থানের জন্য বিদেশে অভিবাসন করেছে। কিন্তু, বাংলাদেশে ফিরে আসা অভিবাসীদের তথ্য সংরক্ষণের কোন প্রক্রিয়া নেই। সরকার, নাগরিক সমাজ, এবং বিশেষজ্ঞদের সবাই ফিরে আসা অভিবাসীদের তথ্য জানতে আগ্রহী। তবুও ফিরে আসা অভিবাসীদের তথ্য সংরক্ষণের কোন পদ্ধতি গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। সম্প্রতি ডেকমা প্রকল্পের অধীনে রামরু ১৪ টি জেলার ৫০ টি মৌজায় জরিপ চালায়। এতে দেখা যায় যে, অভিবাসী পরিবার গুলোর মধ্যে ২৭% হচ্ছে ফিরে আসা অভিবাসী। এই গবেষণায় শুধু তাদেরকেই ফিরে আসা অভিবাসী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে; যারা গত ১০ বছরের মধ্যে ফিরে এসেছে এবং বাংলাদেশে ৬ মাস বা তার অধিক সময় ধরে অবস্থান করছেন। বিএমইটির তথ্য থেকে আমরা জানতে পারি যে, গত ১০ বছরে মোট ৫৬,১৮৬২৪ জন কর্মসংস্থানের জন্য অভিবাসন করেছেন। যদি তাদের মধ্যে ২৭% ফেরত আসে, তাহলে আমরা বলতে পারি, গত ১০ বছরে ১৫,১৭০২৮ জন কর্মী ফেরত এসেছেন।

১.২ নারী অভিবাসন ২০১৬

বাংলাদেশ থেকে নারী অভিবাসন গত কয়েক বছরে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৬ সালের জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত ১,০৮,৭৬৯ জন নারী চাকরি করার জন্য বিদেশে গেছেন যা গত বছরের তুলনায় ১৬ শতাংশ বেশি । পাশাপাশি পুরুষ অভিবাসন বৃদ্ধি পাওয়ায় মোট অভিবাসীদের মাঝে নারী অভিবাসীদের আনুপাতিক হার কমে এসেছে। এবছরে নারী অভিবাসীর সংখ্যা সর্বমোট অভিবাসীর ১৬ শতাংশ। এটিও একটি ইতিবাচক দিক। ২০১৫ সালে নারী অভিবাসী ছিল মোট অভিবাসীর ২২.৮ শতাংশ।

১.৩ গন্তব্য দেশ

বাংলাদেশ থেকে বেশির ভাগ স্বল্পমেয়াদী চুক্তিভিত্তিক কর্মী মূলত মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে অভিবাসন করেন। এ বছরও তার ব্যতিক্রম নয়। ২০১৬ সালে মোট অভিবাসীর প্রায় ৮১% উপসাগরীয় এবং অন্যান্য আরব দেশে অভিবাসন করেছেন। বাকি ১৯ শতাংশের বেশির ভাগ দক্ষিন পূর্ব এশিয়াতে অভিবাসন করেছেন।

১৯৭৬ সাল হতে ২০১৫ সাল পর্যন্ত শুধু উপসাগরীয় এবং অন্যান্য আরব দেশগুলোতে অভিবাসনের হার মোট অভিবাসনের প্রায় ৮২ ভাগ। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াসহ অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহে এ অভিবাসনের হার ১৮ ভাগ। মধ্যপ্রাচ্যে সর্বোচ্চ অভিবাসন ঘটে ১৯৯১ সালে (৯৭.৩০%) এবং সর্বনিম্ন ২০০৭ সালে (৫৮.১০%)।

এবার আমরা দেখি ২০১৬ সালের দেশ ভিত্তিক দৃশ্যপট। ২০১৬ সালের ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি সংখ্যক কর্মী অভিবাসন করেছেন ওমানে। এ বছরের ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশটিতে ১,৮১,৮০৬ জন কর্মী গিয়েছেন, যা বাংলাদেশ থেকে এ বছরের মোট প্রেরিত কর্মীর ২৫.৪% শতাংশ। ২০১৫ সালেও ওমান ছিলো সর্বোচ্চ অবস্থানে।
দীর্ঘদিন ধরেই সৌদি শ্রম বাজারে যে স্থবিরতা বিরাজ করছিল তা গত বছর থেকে কাটতে শুরু করেছে। এ বছরে কাতারকে পিছনে ফেলে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে সৌদি আরব । এ বছর বাংলাদেশ থেকে ১,২৫,৫৮৮ জন শ্রমিক অভিবাসন করেছে সৌদি আরবে; যা ২০১৫ সালের মোট ৫৮,২৭০ জন অভিবাসীর চেয়ে ৫৪ শতাংশ বেশি। ২০১৬ সালে মোট অভিবাসীর ১৭.৬% অভিবাসন করেছে সৌদি আরবে।

তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে কাতার। বার্ষিক প্রবাহের ১৬.১% অর্থাত ১,১৫,২১২ জন শ্রমিক অভিবাসন করেছে কাতারে। মোট ৬৮,৬৭৮ জন অভিবাসী গ্রহণ করে চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে বাহরাইন যা মোট অভিবাসন প্রবাহের ৯.৬% শ্রমিক। ২০১৬ সালে ৫২,১৮৭ জন অভিবাসী গ্রহন করে সিঙ্গাপুর পঞ্চম অবস্থানে নেমে এসেছে। সিঙ্গাপুরে বাংলাদেশ থেকে অভিবাসন হ্রাস পাওয়ার কারণ হল মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে অভিবাসন বৃদ্ধি পাওয়া । ২০১৪ সালে সিঙ্গাপুর ছিল তৃতীয় অবস্থানে।
সংযুক্ত আরব আমিরাত সরকার বাংলাদেশ থেকে পুরুষ শ্রমিকদের অভিবাসনের ওপর নিষেধাজ্ঞা এখনো বহাল রেখেছে। এই দেশ বাংলাদেশ থেকে যে হারে নারী কর্মী গ্রহণ করত এ বছর সেটি বেশ কমেছে। ফলে অভিবাসন ২০১৫ সালের তুলনায় ৬৯% কমে ২৫.২৭১ থেকে ৭,৮০৩ জন এ পৌঁছেছে।
কুয়েতে জনশক্তি প্রেরণ ২০১৫ সালের তুলনায় প্রায় ৫৩% বৃদ্ধি পেয়েছে। এ বছর ৩৬,৮৩৩ জন কুয়েতে অভিবাসন করে যা গত বছরে ছিল ১৭,৪৭২ জন। মালয়েশিয়ার অভিবাসন ২০১৫ সালের ৩০,৪৫৩ জন থেকে বেড়ে ২০১৬ সালে ৩৯,৯৮১ জন এ পৌঁছেছে।

ঝুঁকিপূর্ণ গন্তব্য দেশ : রাজনৈতিক অস্থিরতার কারনে বেশ কিছু দেশে অভিবাসন খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। ইরাক এবং লিবিয়া তাদের মধ্যে অন্যতম। ইরাকে ২০১৫ সালে ১৩,৯৮২ জন কর্মী কাজের উদ্দেশ্যে অভিবাসন করেন। ২০১৬ ইরাকগামী কর্মীর সংখ্যা ৬৬% কমেছে তবে এটা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি। ২০১৬ সালে ৪,৭১৪ জন ইরাকে অভিবাসন করেন। ২০১৬ সালে লিবিয়ায় কোন অভিবাসন হয়নি যা ২০১৫ সালে ছিল ২৩১ জন। বৈধপথে লিবিয়ায় অভিবাসনকে সরকার যুক্তি সংগত কারনেই নিরুৎসাহিত করেছে। কিন্তু বহু সংখ্যক বাংলাদেশী দালালের সহযোগিতায় সুদানের জন্য টুরিস্ট ভিসা সংগ্রহ করে সেখানে যাচ্ছেন। সেখান থেকে স্থলপথে বেনগাজি শহর দিয়ে লিবিয়ায় অভিবাসন করছেন। ঐ দেশে গিয়ে কিন্তু কেউই থাকতে পারছেন না, কিছু দিনের মাথায় ফিরে আসছেন অথবা কেউ কেউ মত্যুবরণ করছেন। লিবিয়ায় অভিবাসন হতে জনগণকে বিরত করার জন্য একদিকে প্রয়োজন ব্যাপক মিডিয়া ক্যাম্পেইন, অন্য দিকে যেসব দালাল চক্র এর সঙ্গে যুক্ত তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ তদন্ত চালিয়ে ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং অভিবাসন আইনের অধীনে মামলা করে কারাদন্ড এবং যথাযথ জরিমানার সাজা নিশ্চিত করা।

দক্ষতা: ২০১৬ সালে দক্ষ কর্মী অভিবাসন পূর্ববতী বছরের তুলনায় প্রায় ৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। এ বছর মোট প্রেরিত কর্মীর প্রায় ৪৩.১% ছিল দক্ষ কর্মী যা গত বছর ছিল ৩৮.৫৬%। পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় এ বছরও দক্ষ কর্মীদের একটি বড় অংশ ছিল নারী শ্রমিক যারা গৃহকর্মী এবং পরিচ্ছন্নতাকর্মী হিসেবে বিদেশে গিয়েছেন। গৃহকর্মী এবং পরিচ্ছন্নতা কর্মীকে দক্ষ কর্মী হিসাবে গণ্য করা নিয়ে প্রশ্ন আছে। আই এল ও ডিসেন্ট ওর্য়াক প্রতিবেদন অনুযায়ী এই সব কর্মীদের দক্ষ কর্মী হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয়নি। ২০১৬ সালে প্রেরিত বাকি কর্মীদের প্রায় ৪০% অদক্ষ শ্রমিক ১৬.২৩% ছিল আধা-দক্ষ শ্রমিক এবং ০.৬১% পেশাজীবি হিসেবে অভিবাসন করেছে।

যদিও সাম্প্রতিককালে অভিবাসন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, তবে দক্ষ কর্মীর সংখ্যা সেরূপ বৃদ্ধি না পাওয়াটা আশংকাজনক যা আমাদের বাংলাদেশী কর্মীদের সেসব সেক্টরে কাজ করতে বাধ্য করে, যেখানে পারিশ্রমিক কম এবং শোষন ও অনিয়মের উদাহরনও অসংখ্য। দক্ষ অভিবাসন বৃদ্ধির জন্য দ্রুত ২০১১ সালে প্রণীত সরকারের জাতীয় দক্ষতা নীতির বাস্তবায়নের প্রয়োজন আছে। বিএমইটি তার সাধ্যমত চেষ্টা করছে বাংলাদেমী কর্মীদের দক্ষতা আর্ন্তজাতিক মানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করতে। যার উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশে প্রদত্ত দক্ষতা সার্টিফিকেট যাতে গ্রহণকারী দেশ সমূহ মানতে বাধ্য হয়। যুক্তরাজ্যভিত্তিক সিটি এন্ড গীল্ডস্ এর এ্যাফিলিয়েশনের আওতায় এনে কয়েকটি প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

উৎস এলাকা: পূর্ববতী বছরগুলোর ন্যায় ২০১৬ সালে সবচেয়ে বেশি আন্তর্জাতিক অভিবাসন হয় কুমিল্লা জেলা থেকে। ২০১৬ সালের নভেম্বর পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মোট অভিবাসনের প্রায় ১১.৫৮% কুমিল্লা জেলা থেকে ঘটেছে। অনুরূপভাবে,প্রায় ৬.১৬% কর্মীর অভিবাসনের মাধমে চট্রগ্রাম জেলাও সাম্প্রতিক বছরগুলোর মত দ্বিতীয় অবস্থান ধরে রেখেছে। অন্যান্য উৎস এলাকাগুলো যথাক্রমে ব্রাহ্মনবাড়িয়া (৫.৯৪%), চাঁদপুর(৪.২৪%), ঢাকা (৪.২৩%), টাঙ্গাইল (৪.২২%) নোয়াখালী (৩.৭৯%), কিশোরগঞ্জ(২.৭১%), মুন্সিগঞ্জ (২.৬৯%) এবং নরসিংদী জেলা (২.৫৮%)। এখানে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় টাঙ্গাইল জেলা থেকে অভিবাসনের ক্ষেত্রে। ২০১৫ সালে এ জেলা থেকে প্রায় ৫.৬২% অভিবাসন ঘটে, যা প্রায় ১.৫% কমে এ বছর ৪.২২% এ নেমে আসে।

পূর্ববর্তী বছরগুলোর ন্যায় এ বছরও আন্তর্জাতিক অভিবাসনের ক্ষেত্রে পার্বত্য জেলাসমূহে কোন পরিবর্তন হয় নি। ২০১৬ সালে বান্দরবন থেকে মোট অভিবাসনের শুধুমাত্র ০.০৭% ঘটে, খাগড়াছড়ি (০.১১%) এবং রাঙ্গামাটি থেকে ০.০৬%। পার্বত্য এলাকা হতে যে অভিবাসন হচ্ছে তা মূলত ঐ এলাকায় বসবাসরত বাঙ্গালী জনগোষ্ঠি হতে। বাংলাদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সিংহভাগই এই তিন পার্বত্য জেলায় বসবাস করে এবং ভিন্ন সংস্কৃতি এবং ভিন্ন ভাষাভাষী এসব জনগোষ্ঠীকে অভিবাসনের মূলস্রোতে আনার প্রচেষ্টা এখনো কার্যকরী নয়। অন্যান্য জনগোষ্ঠি যেমন সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মধ্যে হতেও অভিবাসনের হার খুবই সামান্য।

জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকিতে বসবাসরত জনগোষ্ঠির মধ্যেও আর্ন্তজাতিক অভিবাসনের হার তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। রামরু - ডেকমা গবেষণায় (২০১৬) চিহ্নিত ১৯ টি উপকূলীয়, জলবায়ু পরিবর্তন ও অনান্য দুর্যোগপ্রবণ জেলাসমূহের কোনটিই অভিবাসনের প্রথম সারির উৎস জেলাগুলোর তালিকায় নেই। অবশ্য অভ্যন্তরীন অভিবাসন এসব জেলা হতে প্রায়ই ঘটছে। এবারের সিভিল সোসাইটির পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও সরকারের কাছে দাবী করা হয়েছে যে জলবায়ু পরিবর্তনের দ্বারা যারা পর্যদুস্ত , তাদের জন্য স্থানীয়ভাবে অভিযোজনের বিভিন্ন পদক্ষেপের পাশাপাশি এইসব পরিবারের সদস্যদের আন্তর্জাতিক অভিবাসনের সুযোগ তৈরির লক্ষ্যে দক্ষতা বৃদ্ধি প্রয়োজন।

রেমিট্যান্স:

২০১৬ সালে বিদেশ হতে প্রাপ্ত রেমিট্যান্সের পরিমান আংশকাজনক হারে হ্রাস পেয়েছে। এ বছর নভেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ ১২.৬৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স হিসাবে অর্জন করেছে যা গত বছরের তুলনায় প্রায় ১১% কম। ২০১৫ সালে মোট প্রাপ্ত রেমিট্যান্স ছিল ১৫.৩১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। রেমিট্যান্স এর পরিমান আংশকাজনক হারে কমে যাওয়ায় বিশ্বব্যাংকের ওয়ার্ল্ড ফ্যাক্ট বুক এর রির্পোট অনুযায়ী বাংলাদেশ বৈশ্বিক তালিকায় ৭ম স্থান থেকে ১০ম স্থানে নেমে আসতে পারে। পূর্বের বছরের ন্যায় এ বছরও সর্বাধিক রেমিট্যান্স এসেছে সৌদি আরব থেকে (১৮.৯৮%)।
এর পরপরই যথাক্রমে সংযুক্ত আরব আমিরাত (১৭.৮৮%), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (১৪.৩৪%) এবং মালয়েশিয়া (৯.৩২%)। সৌদি আরব সহ অন্যান্য রেমিট্যান্স প্রেরনকারী রাষ্ট্র যেমন - কুয়েত, সিঙ্গাপুর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য থেকেও রেমিটেন্স প্রেরণের হার কমে এসেছে।

রেমিটেন্স এর এই নেতিবাচক চিত্রের মধ্যেও কাতার এবং ইতালী থেকে রেমিটেন্স উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৬ সালে কাতার থেকে ৪৬৮.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিটেন্স হিসেবে এসেছে, যা গত বছর ছিল ৩৪৪.৮৮ মিলিয়ন ডলার। এ রূপ ইতালী থেকেও ২০১৬ সালে ৩৭৪.৮৬ মিলিয়ন ডলার রেমিটেন্স হিসেবে আসে যা ২০১৫ সালে ছিল ২৮৫.৩৮ মিলিয়ন ডলার। এ বছর রেমিটেন্স এর পরিমান হ্রাস পাবার পেছনে বহুবিধ কারণ উল্লেখযোগ্য যেমন বিশ্ববাজারে তেলের দাম কমে যাওয়ায় মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন তেল উৎপাদনকারী দেশে উন্নয়ন তৎপরতায় শ্লথতা আসা, বিশ্বব্যাপী অভিবাসন বিরোধী রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি হওয়া, ইউরোপে শরনার্থী সংকট, মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন শ্রম গ্রহণকারী দেশের ওপর সিরিয়ার গৃহযুদ্ধসহ লিবিয়া ও ইরাকের রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রভাব প্রভৃতি। অন্যদিকে তেলের দাম পড়ে যাওয়ায় মালয়েশিয়ার রিংগিতের দাম পরে গিয়েছে। ফলে শ্রমিকের প্রকৃত আয় সেখানে কমে গিয়েছে। অথচ সে দেশের সরকার অদক্ষ কর্মীদের কাছ থেকে যে লেভি গ্রহন করতো তা ১৮০০ রিংগিত হতে ২৬৫০ রিংগিতে উন্নিত করেছে। এর প্রভাবও পড়েছে রেমিটেন্স প্রবাহে। সৌদি আরবও অভিবাসীদের রেসিডেন্স পারমিট ফি বাড়িয়েছে।

সেকশন-২

অভিবাসন খাতে গুরুত্তপূর্ন ঘটনাবলী

এসডিজি এবং বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মী:

এসডিজির ১৭ টি লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে বিশ্বব্যাপী ৭ মিলিয়ন লোকের অংশগ্রহণে এবং এর জন্য ৮৩ টি জাতীয় সার্ভের মাধ্যমে। প্রাথমিক পর্যায়ে নিরাপদ অভিবাসনকে একটি লক্ষ্য হিসাবে চিন্তা করা হলেও পরবর্তীতে ১৭ টি লক্ষ্যের মধ্যে তা স্থান পায়নি। কিন্তু তার বদলে মূল দলিলে ১৪,২৩,২৫,২৭ ও ২৯ নং অনুচ্ছেদে নিরাপদ অভিবাসনের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ১৬৯ টি লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। অভিবাসনে সুশাসন এর ফলাফল সকলের জন্য ইতিবাচক করা এবং অভিবাসীর অধিকারকে এইসব টার্গেটের অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। টার্গেট ৮.৭, ৮.৮, ১০.৭, ১০ সি এবং ১৭.৮ এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অভিবাসন গুরত্বপূর্ন ভুমিকা রাখবে বলে মতপ্রকাশ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ প্ল্যানিং কমিশন এবছর এস ডি জির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য একটি কমিটি করেছে। এই কমিটি তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে। তাদের আলোচনার ভেতরে অভিবাসন কিভাবে এস ডি জি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়তা করবে তা রয়েছে তবে তাদের অধিকার রক্ষায়, শ্রমগ্রহণকারি দেশের সাথে আলোচনায় কিভাবে "ডিসেন্ট ওর্য়াক ফর অল" এর লক্ষ্য নিয়ে আসবে তা প্রতিফলিত হচ্ছে না। টার্গেট ৮.১ নিরাপদ কর্মক্ষেত্র , ৮.৭ সকল প্রকার বাধ্যতা শ্রমের অবসান, এস ডি জি ১৩ তে বর্নিত ক্লাইমেট এ্যাকশনের অধীনে কিভাবে নিরাপদ অভিবাসনের সুযোগ বৃদ্ধি করা যায় তা নিয়ে প্ল্যানিং কমিশনকে ভাবতে হবে। এস ডি জি ১৬ এর অধীনে কিভাবে অভিবাসীর জন্য উৎস এবং গন্তব্য দেশে শান্তি, ন্যায়বিচার এবং শক্ত প্রতিষ্ঠান দাবী করা যায় তার ষ্ট্র্যাটেজি নির্মাণ করতে হবে।

নবম অভিবাসন এবং উন্নয়ন বিষয়ক বৈশ্বিক ফোরাম ২০১৬:

'টাইম ফর অ্যাকশন' এ বিষয়কে প্রতিপাদ্য করে গত ৮-১২ ডিসেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় অভিবাসন এবং উন্নয়ন বিষয়ক বৈশ্বিক ফোরাম (এষড়নধষ ঋড়ৎঁস ড়হ গরমৎধঃরড়হ ধহফ উবাবষড়ঢ়সবহঃ) এর নবম সম্মেলন। ২০০৭ সালে শুরু হওয়ার পর বাংলাদেশ প্রথমবারের মত এই বৈশ্বিক সম্মেলনের আয়োজন করে। বিশ্বের প্রায় ১৩০ টি দেশের ৬০০ এর অধিক সিভিল সোসাইটি প্রতিনিধি, অভিবাসন ও শরণার্থী বিষয়ক ৩০টির অধিক আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধি এবং সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন যা সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হওয়া সবচেয়ে বড় বৈশ্বিক সমাবেশ।

সম্মেলনে ৩০০ এর বেশি সিভিল সোসাইটি প্রতিনিধি, অভিবাসনের নানা বিষয়, অভিবাসীদের নিরাপত্তা এবং সর্বোচ্চ সুরক্ষা নিয়ে আলোচনা করেন, যা পরবতীতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ১০ ডিসেম্বর প্রস্তাবনা আকারে সরকারী প্রতিনিধিদের সামনে তুলে ধরা হয়। প্রস্তাবনার আলোচ্য বিষয়সমূহ হল:

(১) সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্রে প্রতিটি অভিবাসীর শ্রম অধিকার, তাদের সর্বোচ্চ সুরক্ষা এবং ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে হবে

(২) নিজ রাষ্ট্র,গন্তব্য রাষ্ট্র এবং ট্রানজিট রাষ্ট্রে সকল দেশে অভিবাসীদের মৌলিক মানবাধিকারসমূহ নিশ্চিত করতে হবে।

(৩) সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে অভিবাসীদের অংশগ্রহন নিশ্চিত করতে হবে এবং কাঠামোগত বৈষম্য দূর করতে স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সমূহকে শক্তিশালী করতে হবে।

(৪) জাতিসংঘ গৃহীত ''টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রা ২০৩০'' এ অভিবাসন সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রাগুলোর বাস্তবায়নে এবং তদারকির জন্য যথাযথ উপায় নির্ধারন করা এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে এবং সকল ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা (এবহফবৎ বয়ঁধষরঃু) নিশ্চিত করতে হবে এবং নারী ও শিশু অধিকার সমূহকে পরিবর্তনের মাপকাঠিতে সর্বাগ্রে বিবেচনা করতে হবে।

৮-৯ডিসেম্বর এর সিভিল সোসাইটি দিবস গুলোর আলোচনার ধারাবাহিকতায় ১০-১২ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয় সরকারী পর্যায়ের আলোচনা। "টেকসই উন্নয়নের জন্য অভিবাসন"এ বিষয় কে প্রতিপাদ্য রেখে অনুষ্ঠিত হওয়া এ সরকারী সম্মেলন ''অভিবাসন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি দ্বিপক্ষীয় সমাধানের চেয়ে একটি আন্তর্জাতিক কৌশল নির্ধারন করা অবশ্যম্ভাবী'' এমন একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়।

এই সম্মেলনের শেষে জাতিসংঘের নিউইয়র্ক ঘোষনা অনুযায়ী গৃহীত হওয়া গ্লোবাল কমপ্যাক্ট (এষড়নধষ ঈড়সঢ়ধপঃ) কে সামনে রেখে ঢাকা ঘোষনা (উযধশধ উবপষবৎধঃরড়হ) তুলে ধরা হয়। এ ঘোষনা অভিবাসন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ন পদক্ষেপ তুলে ধরে যা নিম্নরূপ:

১. অভিবাসনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যয় এখনো দরিদ্র অভিবাসীদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রেরণকারী রাষ্ট্র এবং গন্তব্য রাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে যা কর্মী নিয়েগের খরচ সহনশীল পর্যায়ে উপনীত করে।

২.বিশ্বব্যাপী অভিবাসন ব্যবস্থা যেভাবে শক্তিশালী মাধ্যম হিসাবে রাষ্ট্র সমূহের মধ্যে আন্ত:সমন্বয় এবং কার্যকরী যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরি করেছে, তা ভবিষ্যতে একটি সম্ভাব্য নীতি প্রনয়নে অপরিহার্য এবং রাষ্ট্র সমূহের মধ্যে সর্ম্পক উন্নয়নের প্রচেষ্টা বৃদ্ধি করতে হবে।

৩.বিশ্বব্যাপি গড়ে উঠা অভিবাসন বিরোধী রাজনৈতিক পরিবেশ, রাষ্ট্র সমূহের জন্য সামাজিক ভারসাম্য এবং অংশগ্রহণমূলক সমাজ ব্যবস্থা পরিচালনা চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে। সামাজিক বৈচিত্রের মাঝে সদ্ভাব ও সহায়তার মনোভাব বজায় রাখার জন্য মৌলিক আর্ন্তজাতিক মানবাধিকার নীতমালা সমুহকেই নীতি প্রনয়নের ক্ষেত্রে বিবেচনা করতে হবে।

৪.অভিবাসীদের সুরক্ষা একটি আইনী বাধ্যবাধকতা, এক্ষেত্রে রাষ্ট্রসমূহের জন্য চ্যালেঞ্জ হল একটি অধিকার ভিত্তিক নীতি নির্ধারন করে এর প্রয়োগ নিশ্চিত করা।

৫.সংকটাবস্থায় থাকা অভিবাসীদের জন্য একটি বিশেষ সুরক্ষা ব্যবস্থা নেয়া উচিত এবং এক্ষেত্রে নারী, শিশু এবং পাচার প্রক্রিয়ার শিকার হওয়া ব্যক্তিদের সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া উচিত। সংকটে থাকা অভিবাসীদের নিরাপত্তার সুযোগ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়েরই নিশ্চিত করতে হবে এবং তাদেরকে সকল ধরনের শোষন এবং বৈষম্য থেকে সুরক্ষা দিতে হবে।

৬. সবশেষে, বিশ্বায়ন এবং দ্রুত পরিবর্তিত বিশ্বব্যবস্থায় জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা- ২০৩০ অর্জনে জি এফ এম ডি-ফোরামের একটি অনানুষ্ঠানিক ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা, যা লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রক্রিয়াসমূহ নজরে রাখবে এবং গ্লোবাল কমপ্যাক্ট এবং জিএফএমডি ফোরামের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করবে।

সর্বোপরি,এই ফোরাম অভিবাসন ব্যবস্থাপনাসমূহ উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে এমন আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়। যদিও এই ফোরামে গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ বাধ্যতামূলক নয় (হড়হ-নরহফরহম) তবু একটি গঠনমূলক,প্রতিনিধিত্বশীল এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য এই বৈশ্বিক ফোরাম একটি গুরুত্বপূর্ন ক্ষেত্র যেখানে অভিবাসী এবং অভিবাসনের সাথে সম্পৃক্ত স্থানীয়,আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের দাবি দাওয়া সরাসরি রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিদের সামনে তুলে ধরতে পারে।

এই সম্মেলন আয়োজনের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে এবং বাংলাদেশী অভিবাসীদের সুরক্ষা,নিরাপত্তা এবং তাদের পূর্ণ অধিকারসমূহ নিশ্চিত করনের প্রক্রিয়াকে আরো শক্তিশালী করেছে, যা নিঃসন্দেহে আমাদের অভিবাসন ব্যবস্থাপনার ইতিহাসে একটি মাইলফলক।

গ্লোবাল কমপ্যাক্ট :

এই শতাব্দীর গোড়া থেকেই আন্তর্জাতিক অভিবাসন প্রশাসন বিষয়টি দুটো বিপরীতমুখী ধারা দ্বারা প্রভাবিত হয়। এর একটি ধারা শ্রম অধিকার এবং এ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক মাপকাঠিগুলোর জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব দিয়ে অভিবাসীদের সুরক্ষার বিষয়টি তুলে ধরে। অবশ্য ধারাটি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে এবং রাষ্ট্রের স্বার্থে অভিবাসন ''ব্যবস্থাপনা'' গ্রহনকারী রাষ্ট্রের শ্রম চাহিদা এবং উৎস রাষ্ট্রের অভিবাসীর রেমিটেন্স প্রবাহের বিষয় সমূহকেই মূলত: জোর দিয়ে থাকে। দ্বিতীয় ধারাটির জন্য সীমান্ত ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ন যদিও অভিবাসীর ''নিরাপত্তা ও মর্যাদা''র বিষয়টি নিয়ে তাদের কিছুটা উদ্বেগ রয়েছে। তবে তাদের মূল লক্ষ্য যতটা তা না অভিবাসী তার চেয়ে অভিবাসীর শ্রম।

২০০৩ সালে গ্লোবাল কমিশন অন মাইগ্রেশন (এঈওগ) গঠিত হবার শুরু থেকেই আন্তর্জাতিক অভিবাসন প্রশাসন সংক্রান্ত সকল উদ্যোগই অধিকার ও ব্যবস্থাপনা এই দুই ধারার বিতর্কের মধ্যে আবর্তিত হয় এবং ধারাগুলোর মধ্যে একটি ভারসাম্য আনার প্রচেষ্টা চালানো হয়। ২০০৬ সালের জাতিসংঘের অভিবাসন ও উন্নয়ন সংক্রান্ত উচ্চ পর্যায়ের আলোচনায় এটিই বেরিয়ে আসে যে রাষ্ট্রসমূহ জাতিসংঘের মধ্যে অভিবাসন সংক্রান্ত কোন প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে আগ্রহী নয়। এরই ফলশ্রুতিতে জাতিসংঘ পরিকাঠামোর বাইরে গ্লোবাল ফোরাম অন মাইগ্রেশন ও ডেভেলপমেন্ট (এঋগউ) গঠিত হয়।

এ বছর সেপ্টেম্বর মাসে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে একটি আন্তর্জাতিক সন্মেলনে ''নিরাপদ, সুশৃংখল ও নিয়মিত অভিবাসন সংক্রান্ত একটি বিশ্ব চুক্তি'' (এষড়নধষ ঈড়সঢ়ধপঃ) সম্পাদনের জন্য ২০১৭ সাল থেকে আলাপ আলোচনা শুরু হওয়ার ঘোষনা দেয়া হয়েছে। এ আলোচনা ২০১৯ পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে।

এই গ্লোবাল কমপ্যাক্ট বিশেষ গুরুত্বের দাবী রাখে এই কারনে যে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলো সর্বসম্মতিক্রমে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অভিবাসন প্রশাসন বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে রাজী হয়েছে। এই কমপ্যাক্ট কয়েকটি উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। প্রথমত: নিউইয়র্ক ঘোষনায় আন্তর্জাতিক অভিবাসনের "সকল মাত্রার এবং মানবিক উন্নয়নমূখী মানবাধিকার সম্পর্কিত এবং অন্য সকল দিককে'' বিবেচনায় রাখার বিষয়টি এসেছে। তবে যে প্রেক্ষিতে এবং সময়কালে এ ঘোষনা এসেছে তাতে শংকা থাকে যে শক্তিশালী পশ্চিমা কতগুলো দেশের স্বার্থ রক্ষাই এখানে প্রাধান্য পেতে পারে যা মূলত একটি আঞ্চলিক প্রপঞ্চ,যেখানে অভিবাসন প্রতিহত ও নিবৃত্ত করাকেই গুরুত্ব দেয়া হবে এবং রাষ্ট্রের স্বার্থকেই সমুন্নত রাখবে।

দ্বিতীয়ত: এই চুক্তির লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদী জটিল আলোচনার অন্তরালে পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন প্রবণতা রয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ে বিশেষ সংকট মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় পদ্ধতিগুলোর সংগে আন্তর্জাতিক অভিবাসনের মৌলিক প্রশাসনিক সংস্কার কতটুকু সঙ্গতিপূর্ন তা বিবেচনায় নেয়ার দাবী রাখে।

তৃতীয়ত: নতুন চুক্তিতে সকল অভিবাসীর মানবাধিকার সুরক্ষার বিষটির উল্লেখ থাকলেও একই সাথে 'নিরাপদ, ও নিয়মিত' অভিবাসনের প্রতি যে প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে তা পরস্পরবিরোধী বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। কারন 'নিরাপদ ও নিয়মিত' অভিবাসনের ধারনা, অভিবাসীর অধিকারের চেতনার সাথে মোটেই সঙ্গতিপূর্ন নয়। বর্তমান প্রেক্ষিতে সুরক্ষার বিষয়টি মূলত:মানবিক দিক থেকেই বেশী গুরুত্ব পাচ্ছে। এখানে অভিবাসীদের সুরক্ষায় আন্তর্জাতিক মানবাধিকার নীতিমালা শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো এমনকি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোও নিয়মিত লংঘন করে চলেছে।

চতুর্থত: এ চুক্তির আলোচনা এমন সময় সম্পাদিত হচ্ছে যখন অভিবাসন সংক্রান্ত আইনী ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ক্রমান্বয়ে জাতিসংঘের বহুপাক্ষিক পরিকাঠামোর বাইরে চলে যাচ্ছে যাতে করে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ও শ্রমিক অধিকারের গুরুত্ব খর্ব হচ্ছে এবং এমন একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের উপর সে দায়িত্ব বর্তাচ্ছে যা জাতিসংঘের নীতি কাঠামো (ঘড়ৎসধঃরাব ভৎধসবড়িৎশ) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় এবং যে প্রতিষ্ঠান এ দায়িত্ব পালনের জন্য তার নিজস্ব চার্টারে এ সংক্রান্ত কোন পরিবর্তন অদ্যাবধি আনেনি। যদিও কোন কোন রাষ্ট্র এবং প্রতিষ্ঠান ঐ প্রতিষ্ঠানকে এই চুক্তি আলোচনা

মূল ভূমিকায় রাখতে আগ্রহী, অন্যান্য রাষ্ট্র এবং জাতিসংঘের কিছু প্রতিষ্ঠান এর বিরোধিতা করছে। তাদের বিরোধিতার মূল কারণ হলো জাতিসংঘ কেন্দ্রীক প্রক্রিয়াই কেবল আন্তর্জাতিক মানবাধিকার এবং শ্রম অধিকার নিশ্চিত করতে পারবে।

রোহিঙ্গা শরনার্থী

১৯৯১-২ তে এদেশে আশ্রয়লাভকারী রেহিঙ্গাদের প্রায় ৩৩,০০০ হাজার শরনার্থী কক্সবাজার টেকনাফ অঞ্চলের ২ টি ক্যাম্পে অবস্থান করছেন। এদের দেখভাল বাংলাদেশ সরকার করছে। বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের মতে আরো তিন থেকে পাঁচ লক্ষ রোহিঙ্গা অনিবন্ধিত অবস্থায় দেশের দক্ষিন পূর্ব জেলাগুলোতে বসবাস করছেন। এই জনগোষ্ঠিকে শরনার্থী হিসাবে বাংলাদেশ স্বীকৃতি দেয়নি। এর ফলে অবৈধ অভিবাসী হিসাবে তারা বিবেচিত হচ্ছেন এবং নানা ধরনের অনিশ্চয়তা ও প্রতিকূলতার শিকার হচ্ছেন। কোন ধরনের আইনী স্বীকৃতির অভাব এদের অবস্থানকে ভয়ানকভাবে সঙ্গীন করেছে এবং এরা নানাভাবে অন্যায়, অত্যাচার ও নিগ্রহের শিকার হচ্ছেন। আশ্রয়হীন নারীরা মানবপাচারকারীদের বিশেষ লক্ষ্যবস্তুতে পরিনত হচ্ছেন।

এই রূঢ় বাস্তবতার আলোকেও সরকারের নীতির কোন পরিবর্তন এখনো পর্যন্ত ঘটেনি। বাংলাদেশ সরকার ২০১৪ সালে অনিবন্ধিত মায়ানমার নাগরিকদের সংখ্যা নিরূপনের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ সংক্রান্ত ২১.৭ কোটি টাকার একটি প্রকল্প পরিকল্পনা কমিশন অনুমোদন করে। যদিও ২০১৬ সালে মার্চ মাসের মধ্যে এ শুমারী বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সম্পাদনের কথা ছিল, কিন্তু তা অদ্যাবধি সম্পন্ন হয়নি। এই শুমারীর লক্ষ্য, পদ্ধতি এবং এ থেকে প্রাপ্ত তথ্য কিভাবে ব্যবহৃত হবে সে সম্পর্কে কোন স্বচ্ছ ধারনা এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। জীবনের ভয়ে ভীত হয়ে অন্য দেশে আশ্রয় প্রার্থী হিসাবে স্বীকৃতি না পাওয়া এই জনগোষ্ঠিকে কোনো ধরনের সুরক্ষা প্রদান ব্যতিরেকে এই ধরনের শুমারী স্বভাবতই নানা প্রশ্নের জন্ম দেয়। তাছাড়া এই শুমারীতে অন্য আর্ন্তজাতিক প্রতিষ্ঠানের সম্পৃক্ততা থাকলেও জাতিসংঘের শরনার্থী বিষয়ক হাই কমিশনের অফিসকে সংযুক্ত না করাটা এই উদ্যোগকে কিছুটা হলেও প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

২০১৩ সালে থেকে মায়ানমারের রাখাইল অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা পর্যায়ক্রমে ভয়ানক রুপ ধারন করে। উগ্র বৌদ্ধ জনগোষ্ঠি নানা অজুহাতে মুসলিম রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির উপর একের পর এক সহিংস আক্রমন চালায় । রাষ্ট্রীয় বাহিনীগুলো এক্ষেত্রে তাদের নিবৃত্ত করার কোন প্রচেষ্টা না চালিয়ে বরং উৎসাহই প্রদান করে। এই বাস্তবতার প্রেক্ষিতে হাজার হাজার রোহিঙ্গা শরনার্থী বাংলাদেশে আশ্রয় প্রার্থনা করলেও সরকার তার অবস্থানে অটল থাকে। ফলে রোহিঙ্গারা নৌপথে থাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়া যাবার একটা বিপদসংকূল বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করে। বলা বাহুল্য এই অনিয়মিত অভিবাসন অতি অল্প সময়ের মধ্যে মানবপাচারকারীদের নিয়ন্ত্রনে চলে যায়। থাই - মালয়েশিয়া সীমান্তে বন্দি শিবির, গণকবর এবং সলিল সমাধির শিকার কেবলমাত্র রোহিঙ্গারা ছিলেন না বাংলাদেশীরাও তার অর্ন্তভুক্ত ছিলেন।

এ বছর অক্টোবর মাসের প্রথম দিকে মায়ানমারের আইন শৃংখলা বাহিনীর এক হামলায় ৭ জন কর্মকর্তার মৃত্যু ঘটে। এর জন্য দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত ও তাদের শাস্তির ব্যবস্থা না করে জঙ্গি রোহিঙ্গারা ঘটনার জন্য দায়ী অভিযোগ তুলে সে দেশের সেনা বাহিনী রাখাইন প্রদেশে সাধারন রোহিঙ্গাদের উপর পর্যায়ক্রমে সশস্ত্র আক্রমন চালায়। হত্যা, অগ্নি সংযোগ ও ধর্ষণ হয়ে উঠে নিয়মিত ঘটনা। এমনকি হেলিকপ্টার গানশিপ থেকে নিরস্ত্র ও নির্দোষ জনগনের উপর নির্বিচারে গুলি বর্ষণ করা হয়। উপগ্রহের মাধ্যমে সংগৃহিত তথ্য অনুযায়ী জানা যায় যে প্রায় ১৫০০ রোহিঙ্গাদের বাড়ি ঘরে সুপরিকল্পিতভাবে অগ্নি সংযোগ করে ধ্বংস করা হয়েছে। মায়ানমার সেনা বাহিনীর এই হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞকে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ হিসাবে এবং গণহত্যা হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে।

অক্টোবর ২০১৬ থেকে প্রায় ৩৫,০০০ নতুন শরনার্থী বাংলাদেশে আশ্রয়প্রার্থী হিসেবে প্রবেশ করেছেন। বাংলাদেশ সরকার এখনো পর্যন্ত সীমান্ত বন্ধ রেখে আশ্রয় প্রার্থী হাজার হাজার রোহিঙ্গাকে এদেশে ঢুকতে বাধা দিয়ে এবং তাদের বহনকারী নৌযান গুলোকে ফেরৎ পাঠাচ্ছে। এতে করে অনেকেরই জীবন মারাত্নক হুমকির সমুখীন হচ্ছে। আশ্রয় প্রদানে সরকারের এই অনীহা এ দেশে ঢুকে পড়া অনেক রোহিঙ্গাকেই চরম অনিশ্চয়তায় ফেলে দিয়েছে। এর ফলে শীতের এই মৌসুমে খোলা আকাশের নিচে থাকা নারী এবং শিশুরা নিমোনিয়াসহ নানা রোগের শিকার হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে আমরা মনে করি মানবিকতা ও আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতা থেকে বাংলাদেশ মৃত্যু ভয়ে ভীত এই রোহিঙ্গা আশ্রয়প্রার্থীদের এদেশে প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়ে তাদের জন্য নিদিষ্ট আশ্রয়স্থল, সুপেয় পানি, খাদ্য,বস্ত্র ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে। এ দায়িত্ব পালনে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কেও যথাযথভাবে এগিয়ে আসতে হবে। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী যেন নিজ দেশে মর্যাদার সাথে নাগরিক হিসেবে ফিরে যেতে পারেন তার জন্য একটি কার্যকরী কূটনৈতিক তৎপরতা চালাতে হবে। বিভিন্ন

সূত্র থেকে জানা গেছে যে অনেক রোহিঙ্গারা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছেন। এ দিক থেকে দেশের নিরাপত্তার স্বার্থেই সরকার তার অবস্থানের পূনর্বিবেচনা করে শরনার্থীদের নিবন্ধন করে নিদিষ্ট স্থানে আশ্রয়ের ও জীবন ধারনের অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহন করার উদ্যোগ নেয়াই হবে সমীচিন কাজ। এতে করে একদিকে যেমন বাংলাদেশ তার নৈতিক ও আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালন করবে, অন্যদিকে তা দেশের নিরাপত্তাকেও নিশ্চিত করবে।

মালয়েশিয়ায় লেভি বৃদ্ধিঃ

তেলের মূল্য হ্রাস পাওয়াতে মালয়েশিয়ায় টাকার মান ক্রমাগত কমে চলছে। বর্তমানে মালয়েশিয়ায় ১ রিংগিত বাংলাদেশী ১৭.৪০ টাকা। পূর্বে যা ছিল ২৩ থেকে ২৪ টাকা। ফলে সে দেশে কাজ করা বাংলাদেশীদের প্রকৃত আয় অনেক কমে গেছে। একই সাথে এবছরে মালয়েশিয়া সরকার অদক্ষ কর্মীদের থেকে যে লেভি গ্রহন করে তা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়টি দরিদ্র কর্মীদের উপর একটি বড় ধরনের চাপ তৈরী করেছে। লেভি গ্রহনের পক্ষে মালয়েশিয়া সরকারের যুক্তি হচ্ছে, বিদেশ হতে অদক্ষ কর্মী আনাকে অনুৎসাহিত করতে তারা নিয়োগদাতার উপর এই লেভি বসিয়েছে। কিন্তু কার্যত এই লেভি অভিবাসী কর্মীরাই দিচ্ছে। সার্ক রাষ্ট্রগুলো একত্রিতভাবেই মালয়েশিয়া সরকারের সাথে দরকষাকষি করতে পারে এই লেভি ব্যবস্থা প্রত্যাহারের জন্য।

নিয়োগ প্রক্রিয়া ও অভিবাসীদের দূর্ভোগ

এবারের জি এফ এম ডি তে বেশ গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে এথিকাল রিক্রুটমেন্ট এর বিষয়টি। সারা বিশ্ব জুড়ে রিক্রুটমেন্ট ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক অব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়েছে। অভিবাসীরা অভিবাসনের দেশে যেমন প্রতারণার মুখে পড়ছেন, তেমনি তারা নিজ দেশেও প্রতারিত হচ্ছেন। বাংলাদেশ সরকার এ বিষয়ে নীতি ও আইন তৈরী করেছেন, তবুও প্রতারণা কমানো যায়নি। এবছরের রিপোর্টে রামরু এই নিয়োগপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতারণাকে সবচেয়ে বড় ইস্যু হিসেবে চিহ্নিত করছে। রামরু কর্তৃত সম্প্রতি প্রকাশিত ১৫০ জন নারী ও পুরুষ অভিবাসীর না বলা গল্পগুলো এ চিত্র তুলে ধরে যে, ভিসা ও ওয়ার্ক পারমিট প্রাপ্তির পুরোটা বিষয় অনানুষ্ঠানিকভাবে হচ্ছে। ঐ দেশে অবস্থানরত বাংলাদেশীদের মধ্যে স্বত্বভোগীদের বাংলাদেশের রিক্রুটমেন্ট এজেন্সীদের কার কার সাথে যোগাযোগ রয়েছে। তারা ঐ দেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী কর্মীদের কাছে ওয়ার্ক পারমিট বিক্রি করেন। তারাই বলে দেন যে ঢাকায় কোন এজেন্টের মাধ্যমে এ ভিসাটি প্রসেস করতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় নিয়োগ কর্ম পরিচালিত হচ্ছে বলে, এখানে অসাধু উপায় অবলম্বন করলে তাকে শাস্তি দেবার জন্য কোন দেশী ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এ ব্যাপারে সুক্ষ্ম বিশ্লেষণ প্রয়োজন। অভিবাসীদের স্বার্থে প্রয়োজনে এই ভিসা সংগ্রহের পদ্ধতি হতে বের হয়ে আসতে হবে।

আইন সংস্কার

সরকার ২০১৩ সালের অক্টোবর মাসে বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং অভিবাসন আইন ২০১৩ প্রবর্তন করে। রামরুর সাম্প্রতিক আয়োজিত বেশ কিছু আইন বিষয়ক আলোচনা সভা থেকে প্রতিপন্ন হয় যে এই আইনের অধিনে খুব কম মামলা দায়ের হচ্ছে। এই আইনের অধীনে ২০১৬ সাল পর্যন্ত মাত্র ৮টি মামলা দায়ের হয়েছে । আইন প্রবর্তনের পর তার অধীনে মামলা না হলে আইনটি পরবর্তীতে অকার্যকর হয়ে যেতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। সম্প্রতিক গবেষনায় দেখা গেছে; অভিবাসন ইচ্ছুকদের এক-তৃতীয়াংশ কোন না কোন ভাবে প্রতারিত হয়েছেন এবং অভিবাসনে ব্যর্থ হয়েছেন। এত প্রতারনার ঘটনা ঘটলেও যারা এর শিকার তারা আইনের সহায়তা নিচ্ছেন না। এর অনেক গুলো কারন রয়েছে প্রথমত: আইন সম্পর্কে অজ্ঞতা, দ্বিতীয় অভিবাসন ইচ্ছুকরা ভাবছেন যে বিচার চাইলে তাদেরও বিদেশ যাবার সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, তৃতীয়ত মামলা পরিচালনা সময় এবং ব্যায় সাপেক্ষ। চতুর্থত: প্রতারক চক্রের ব্যবপাওে এক ধরনের ভীতিও কাজ করে। এসব মিলিয়ে আইন প্রয়োগ বেশ সীমিত হয়ে পড়েছে। আভিবাসন আইন ২০১৩ কে প্রয়োগ কারার জন্য চারটি বিধি তৈরীর কাজ চলছে। দুর্ভাগ্য বসত তা এ বছয়েও শেষ হয়নি। এ আইনের প্রয়োগ বাড়াতে অইন প্রয়োগকারী সংস্থা, বিচারিক সংস্থা এবং ভুক্তভোগী অভিবাসী, সকল কেই এই আইনের বিষয় অবহিত করা প্রযোজন। তাছাড়া,নাগরিক সমাজের মতামতকে আমলে নিয়ে বিধি প্রনয়ন দ্রুত সমাপ্ত করা প্রযোজন। ২০১৬ সালে প্রবাসী কল্যাণ এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি গৃহিত হয়।

৪ সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল:

১৯৯০ সাথে প্রতিষ্ঠিত ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিলের মূল উৎস হল বিদেশগামী কর্মীদের বাধ্যতামূলক প্রদান কৃত চাঁদা, রিক্রুটিং এজেন্সী সমূহের লাইসেন্সের খরচ বাবদ জমা কৃত অর্থের সুদ, বিদেশের দূতাবাস হতে কনসুলার ফি বাবদ প্রাপ্ত অর্থ, এবং ওর্য়াক পারমিট এবং কাজের ডিমান্ড, সত্যায়িত করার ফি ইত্যাদি। প্রতিটি কর্মী ৩৫০০ টাকা করে যে টাকা এবছরে প্রদান করেছেন। শুধু শ্রমিকদের চাঁদা থেকে এবছর এই তহবিলে জমা হয়েছে আনুমানিক ২৬২.৫ কোটি টাকা। এই ফান্ড ব্যবহার করে ২০১৬ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত ৪৪৫০১ জন র্কমীকে প্রাক গমন ব্রিফিং প্রদান হয়েছে। ২০১৫-১৬ এবং ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে সেইফ হোম পরিচালনায় খরচ হয়েছে ১০,৬০,০০০০ টাকা। মৃত ব্যক্তির পরিবহন ও দাফন বাবদ অক্টোবর ২০১৬ পর্যন্ত খরচ ৮,৫১,৯০,০০০। একই সাথে মৃতব্যক্তির পরিবার কে প্রদান করা হয়েছে ১২৮,৬৪,৪৪,৮৬২ টাকা। বকেয়া আদায় হয়েছে ৪৮,৪২,৯২,২৮৯ টাকা। ৩৬ জন আহত/ পংগু কর্মীর ক্ষতিপূরণ সেসন বাবদ ৩,৩৫,০০০০ টাকা। আদায় করে দিয়েছে বি.এম.ই.টি। ২০১৬ সালে জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত শিক্ষা বৃত্তি দেওয়া হয়েছে ১২১,৭৫০০০ টাকা । এই অর্থ ব্যবহার করে এ বছরে 'প্রবাসী বন্ধু' নামে একটি কল সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে । এর মাধ্যমে অভিবাসীরা সরাসরি তাদের সমস্যা জানাতে পারবেন। এছাড়া এই টাকা হতে বিদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহায়তা, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকে সহায়তা, প্রবাসী কল্যাণ ভবনে ওয়ান ষ্টপ 'সার্ভিস' প্রতিষ্ঠা, অফিস অটমেশন, কল সেন্টার স্থাপন, বোর্ডের অফিস স্থাপন, বিদেশগামী কর্মীদের স্মার্ট কার্ড প্রদান, দূতাবাস সমূহে গাড়ি প্রদানসহ কিছু কর্মীর বেতন এই ওয়েজ আর্নার্স ওয়েল ফেয়ার ফান্ড হতে পরিচালনা করা হয়ে থাকে। অন লাইনে রেজিষ্ট্রেশন প্রকল্প, এসি ক্রয়, গাড়ির তেলের দাম, বাজার খোঁজার জন্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের বিদেশ সফরসহ আর কিছু ব্যয় এই ফান্ড থেকে নেয়া হচ্ছে।

একথা সত্য যে এই ফান্ডটি থাকার কারনে সরকার বিশেষত প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয় অভিবাসীদের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক কার্যক্রম হাতে নিতে পেরেছে এবং তাতে অনেক অভিবাসী উপকৃত হয়েছেন। সরকারের রেভিনিউ বা উন্নয়ন বাজেট থেকে এই সহায়তাগুলো বের করে আনা বেশ কঠিন হত। তবু বেশ কিছু ক্ষেত্রে এই ফান্ডের ব্যবহার যৌক্তিক নয়। যেমন এই অর্থ সংগৃহিত হচ্ছে স্বল্পমেয়াদী অভিবাসীদের চাঁদা হতে। সেহেতু এই অর্থ দীর্ঘমেয়াদী অভিবাসীদের সন্তানদের স্কুল স্থাপনে ব্যবহার যুক্তি সংগত নয়। দীর্ঘমেয়াদী কর্মীদের সন্তানদের স্কুল অত্যন্ত ভাল উদ্যোগ, তবে তা হওয়া উচিত সরকারের নিজস্ব বাজেট হতে। স্বল্পমেয়াদী অভিবাসীরা মূলত গ্রাম থেকে বিদেশে যেয়ে থাকেন। তাদের রেমিটেন্স তারা মূলত গ্রামে বা তাদের জেলা শহরে বিনিয়োগ করেন। ঢাকার কাছে ভাটারার মত হাউজিং প্রকল্পে কখনই এই ফান্ড বিনিয়োগ যুক্তি সংগত নয়। এই ফান্ড হতে সরকারী কর্মকর্তাদের বেতন প্রদানও ঠিক নয়। শ্রমিক অভিবাসীর সরসরি কল্যাণে আসে এমন কর্মকান্ডে যেমন গ্রহনকারী দেশে শেল্টার হোম স্থাপনে ও বন্দী কর্মীদের আইনী সহায়তা প্রদানে তাদের দোভাষী সেবা নিশ্চিত করনে । মৃত কর্মীদের লাশ প্রত্যাবর্তনের জন্য দূতাবাসগুলোর বাজেট অত্যন্ত সীমিত। সেখানেও বাজেট বাড়ানো প্রয়োজন। প্রতিবছর এই ফান্ডের একটি এক্সটার্নাল অডিট হওয়া প্রয়োজন এবং এর ব্যবহার কোন কোন খাতে কত হয়েছে তা সকলকে অবগত করাও জরুরী। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড পরিচালনার জন্য মন্ত্রনালয় একটি আইন প্রণয়নের কাজ শুরু করেছে। আশা করা যায় এই আইন একটি দক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারবে।

রিক্রুটিং এজেন্সী

বিএমইটির তথ্যমতে বর্তমানে ১০৩৮ টি লাইসেন্সপ্রাপ্ত রিক্রুটিং এজেন্সি রয়েছে। নারী কর্মী প্রেরণকারী রিক্রুটিং এজেন্সির সংখ্যা ২৯৭টি। বিএমইটির তথ্যমতে ৮৮টি রিক্রুটিং এজেন্সির লাইসেন্স স্থগিত করা হয়েছে। রিক্রুটিং এজেন্সি সমুহ এথিকাল রিক্রুটমেন্ট নিশ্চিত করতে একটি নীতিমালা তৈরী করেছে। কিন্তু এই নীাতিমালা ভঙ্গ করলে রিক্রুটিং এজেন্সির এসোসিয়েশন আজ পর্যন্ত কোন সদস্যের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নিয়েছে বলে শোনা যায়নি।

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক

বর্তমানে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক এর ৫৫টি শাখা রয়েছে। এর মধ্যে ২০১৬ সালে মাগুরা, নড়াইল, গাইবান্ধা, জামালপুর ও লক্ষীপুরে ৫টি নতুন শাখা খোলা হয়েছে। ২০১৬ সালের জানুয়ারি থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত যেখানে মোট ৬,৮৮,৮৬৯

জন বাংলাদেশী বিভিন্ন দেশে অভিবাসন করেছেন, সেখানে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক ২০১৬ সালের জানুয়ারি থেকে অক্টোবর সময়ের মধ্যে ৫২১২ জনকে ৫৪ কোটি ৮৫ লাখ টাকা অভিবাসন ঋণ প্রদান করেছেন এবং একই সময়ের মধ্যে মাত্র ৪ জন প্রত্যাগত অভিবাসীকে ৪ লক্ষ টাকা পুনর্বাসন ঋণ প্রদান করেছেন। ২০১৫ সালে ৫,৩৮,৬৬৭ জনের বেশী অভিবাসী চাকরি নিয়ে বিদেশে গেছেন, যার মধ্যে মাত্র ৫৪৬৩ জন এই ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে সক্ষম হয়েছেন। এই ৫৪৬৩ জন যে ঋণ নিয়েছেন তার পরিমাণ হলো ৪৮,৬৯০,৬০০০ টাকা। অর্থাৎ ২০১৫ সালের চেয়ে এ বছর কম সংখ্যক মানুষ অভিবাসন ঋণ গ্রহণ করেছেন।

জেলা জনশক্তি ও কর্মসংস্থান অফিস

বিএমইটি'র অধীনে বিভিন্ন জেলায় ৪২ টি জেলা জনশক্তি ও কর্মসংস্থান অফিস কাজ করছে। প্রবাসী কল্যান ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ৬৪ জেলায় জেলা জনশক্তি ও কর্মসংস্থান অফিস এবং ৭টি বিভাগীয় শহরে বিভাগীয় কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস স্থাপনের পদক্ষেপ নিয়েছে, যা ২০২০ সাল নাগাদ সম্পন্ন হবে। কিন্তু বিদ্যমান অফিসসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো মূল্যায়ণ করতে গেলে দেখা যায়, প্রায় অর্ধেক অফিস উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছাড়াই পরিচালিত হচ্ছে এবং এই অফিসগুলোর প্রায় অর্ধেক পদ খালি রয়েছে। এছাড়া শ্রমিকদের যথাযথ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এসব অফিসের কর্মকর্তা/জনবল নিয়মিতভাবে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ পাচ্ছে না। এসব জেলা অফিসের আওতায় উপজেলা পর্যায়ে কোন অফিস নাই। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিয়য় হল যে বিএমইটি এখনও পর্যন্ত সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ড ঢাকা অফিস হতে পরিচালনা করছে। ডেমো অফিস গুলোতে ক্ষমতা ও কর্ম ডিসেন্টালাইজেশনের (উবপবহঃৎধষরংধঃরড়হ) ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে। ডেমো কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষনের ক্ষেত্রেও ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে।

কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

বিএমইটির অধীনে বর্তমানে ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি (আইএমটি) ৬ টি এবং ৬৪ টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বা টিটিসি এবং ৩টি শিক্ষানবিশ প্রশিক্ষণ দপ্তর রয়েছে।[১] এর মধ্যে হাউজকিপিং ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদানকারী টিটিসি'র সংখ্যা ৩০ টি এবং বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের প্রি-ডিপার্চার ট্রেনিং প্রদানকারী টিটিসি'র সংখ্যা ০৬টি। এসব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৭৪ জন মূখ্য ইন্সট্রাক্টর থাকার কথা, যেখানে আছেন ২৮ জন, উচ্চমান ইন্সট্রাক্টর থাকার কথা ২৪৪, সেখানে আছেন ১৩০ এবং যেখানে সাধারণ ইন্ট্রাক্টর থাকার কথা ৩৯১ জন, সেখানে আছেন ২৯৬ জন। এছাড়াও উপজেলা পর্যায়ে ৪০ টি টিটিসি ও চট্টগ্রামে ১ টি টিটিসি স্থাপনের কাজ চলছে।[২] ২০১৬ সালে, জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত ১,২১,০০০ অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দক্ষতার ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে।

লেবার এ্যাটাশে

লেবার অ্যাটাশেরা মূলত অভিবাসীদের গন্তব্যদেশ এবং তাদের মূলদেশের মধ্যে সংযোগ সেতু হিসেবে কাজ করে। বর্তমানে ২৬ টি দেশে ২৯ টি লেবার উইং কাজ করছেন। এর মধ্যে সম্প্রতি মরিশাসে ১টি উইং নতুন চালু করা হয়েছে। লেবার অ্যাটাশেদের সংখ্যার অপ্রতুলতা অভিবাসীদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের পথে মূল বাধা। বর্তমানে বাংলাদেশ থেকে নারী অভিবাসীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায়, এখন উচিত বিদেশে শ্রম বিভাগগুলোতে আরো নারী সদস্য নিয়োগ দেয়া। স্থানীয় ভাষাজ্ঞানের অভাব ও দোভাষী এবং আইনী পরামর্শক নিয়োগের জন্য অপ্রতুল অর্থায়ন সেসব দেশে অভিবাসীদের ন্যায়বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধকতা।

বানিজ্যিক ভাবে গুরত্বপূর্ন ব্যক্তি (সি আই পি)

দীর্ঘমেয়াদি অভিবাসী যারা বৈধ চ্যানেলে রেমিটেন্স পাঠান এবং বিদেশে বাংলাদেশী পণ্য রপ্তানী করছেন এমন অভিবাসীদের সি আই পি হিসাবে সম্মাননা দিয়ে আসছে বেশ কিছু বছর ধরে। এবছরে এই সম্মাননা দেয়া হয় ১৮ ডিসেম্বর যে দিনটি অত্যন্ত আড়ম্বরের সাথে বর্তমানে বাংলাদেশে পালিত হচ্ছে। এ বছর যারা সম্মাননা পেলেন তাদের পাঁচজন কুমিল্লার, তিনজন ঢাকা শহরের এবং বাকি একজন সিলেট এর। দীর্ঘমেয়াদি অভিবাসীদের সম্মানিত করা সরকারের একটি অত্যন্ত ভাল উদ্যোগ। তবে এই সম্মাননা শুধু রেমিটেন্স প্রেরণকে বা পণ্য রপ্তানিকে কেন্দ্র করে হওয়া উচিত নয়। বহু প্রত্যাবর্তিত অভিবাসী বাংলাদেশে শিক্ষা বিস্তারে, ব্যবসা বানিজ্য ও শিল্প স্থাপনে বা বিজ্ঞানের প্রসারে ভূমিকা রেখেছেন। তাদেরও এই সম্মাননার অন্তর্ভূক্ত করা উচিত।

---

[১] স্মরণিকা, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ২০১৬, পৃষ্ঠা ৯৮

[২]. স্মরণিকা, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ২০১৬, পৃষ্ঠা ৯৯

অন্যদিকে সাধারন অভিবাসীরা সংখ্যায় অনেক এবং তাদের অনেকে নিয়মিত চ্যানেল ব্যবহার করে রেমিটেন্স প্রেরণ করছেন। তাদের নিজস্ব রেমিটেন্সের পরিমান হয়তো বেশ কম তবে দেশের সার্বিক প্রেক্ষাপটে এর গুরত্ব অপরিসীম। তাদের নিয়মিত আয়ের ৫০ শতাংশ এর বেশি (নারী শ্রমিকরা ৯০ শতাংশ) দেশে প্রেরণ করে থাকেন। এই শ্রম অভিবাসীদের অর্জনকে সম্মানিত করার কোন ব্যবস্থা সরকার আজও নিতে পারেনি। এদের ঘামের টাকায় যেহেতু দেশের চাকা ঘুরছে তাদেরকে সম্মানিত করাও একইভাবে জরুরি, যেমন জরুরি সকল পেশায় অবদান রাখা দীর্ঘমেয়াদি অভিবাসীদের।

৫. নাগরিক সমাজ

'জিএফএমডি' কে ঘিরে বাংলাদেশের নাগরিক সমাজের উদ্যোগ

২০১৬ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত অভিবাসন ও উন্নয়ন সংক্রান্ত বৈশ্বিক সম্মেলন বা 'জিএফএমডি'কে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের নাগরিক সমাজ প্রায় পুরো বছর জুড়েই দেশব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। 'জিএফএমডি' কে ঘিরে বাংলাদেশের নাগরিক সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগটি ছিল অভিবাসন নিয়ে কাজ করে এমন কতিপয় সংস্থাকে নিয়ে 'বাংলাদেশ সিভিল সোসাইটি কোঅর্ডিনেশন কমিটি ফর জিএফএমডি' বা 'বিসিএসসিসি' গঠন করা। উল্লেখ্য ২০১৬ সালের ৫ই মার্চ নাগরিক সমাজের ২৯টি সংস্থাকে নিয়ে 'বিসিএসসিসি' আনুষ্ঠানিকভাবে কর্মকান্ড শুরু করে। ২০১৬ সালের 'জিএফএমডি' কে ঘিরে 'বিসিএসসিসি' এর ২০টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এসব বৈঠকে অভিবাসন ও উন্নয়ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। এছাড়া 'বিসিএসসিসি' এর ব্যানারে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে এই সংক্রান্ত মোট ৬৩টি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কর্মসূচিগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

আইন ও সালিশ কেন্দ্র র‍্যালি ও পথসভাসহ মোট ৪টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। তাদের কর্মসূচির মূল বক্তব্য ছিল নিরাপদ অভিবাসন ও অভিবাসীদের মানবাধিকার নিশ্চিত করা। বাসুগ নিজ দেশে ডায়াসপোরাদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করেছে এবং টিভি টকশোতে অংশগ্রহণ করেছে। মহিলা অভিবাসীদের অধিকার নিশ্চিত করার দাবি জানিয়ে বোমসা গ্রাম পর্যায়ে ২০টি উঠান বৈঠক করেছে। মানব পাচার প্রতিরোধে স্থানীয় প্রশাসনের প্রোএকটিভ ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করে ব্র্যাক নিরাপদ অভিবাসন বিষয়ে খুলনা ও চট্রগ্রামে দুটি গোল টেবিল বৈঠক করেছে। এছাড়াও ঢাকাতে তারা বৈদেশিক কর্মসংস্থান বিষয়ক একটি জাতীয় পর্যায়ের সেমিনার করেছে। ইনাফি 'অভিবাসন ও এসডিজি' সংক্রান্ত দুটি জাতীয় পর্যায়ের সেমিনার আয়োজন করেছে। তাদের মূল দাবি ছিল উন্নয়ন পরিকল্পনায় ডায়াসপরাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। অনিরাপদ শ্রম অভিবাসনের সমস্যা ও এটি বন্ধে করনীয় পদক্ষেপ চিহ্নিত করে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন একটি জাতীয় পর্যায়ের সেমিনারের মাধ্যমে তাদের গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছে। তাদের গবেষণায় মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন বলেছে যে অনিয়মিত শ্রম অভিবাসন নিয়ন্ত্রন করার জন্য সরকারকে একটি সমন্বিত ও বহুমাত্রিক জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। অকুপ দুটি জাতীয় পর্যায়ের সেমিনার আয়োজন করেছে। একটি সেমিনারে তারা জাতীয় বাজেটে অভিবাসীদের জন্য সুর্নিদিষ্ট অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব করেছে। অপরটিতে অভিবাসীদের জন্য পৃথক স্বাস্থ্য সেবা চালুর দাবি করেছে। রামরু জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে মোট ৬টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। এসব কর্মসূচির মূল বক্তব্য ছিল শ্রম অভিবাসন ব্যয় কমিয়ে আনা, অভিবাসনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যয় সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি, এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসন আইনের অধীনে অপরাধীদের বিচার নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত দাবি তুলে ধরা। ওয়ারবে জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে মোট ১৮টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। তারা তাদের কর্মসূচির মাধ্যমে অভিবাসীদের সুরক্ষায় মূলত 'জিএফএমডি' এর গুরুত্বকে তুলে ধরেছে।

অভিবাসন, উন্নয়ন ও মানবাধিকার বিষয়ক বৈশ্বিক সম্মিলন (পিজিএ)

গত ৫-৭ ডিসেম্বর ২০১৬ সালে ঢাকাতে অনুষ্ঠিত হয়েছে "অভিবাসন, উন্নয়ন ও মানবাধিকার বিষয়ক বৈশ্বিক সম্মিলন" যা 'পিজিএ' নামে পরিচিত। বৈশ্বিক নাগরিক সমাজের উদ্যোগে 'জিএফএমডি' কে ঘিরে 'পিজিএ' অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ২০১৬ সালের 'পিজিএ' তে বিশ্বের ৩৩ দেশের ৩৭৭ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছেন। জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিবাসন, শ্রম অভিবাসন ও নিয়োগ প্রক্রিয়া, বর্ণবাদ, অভিবাসন ব্যবস্থাপনা, মিশ্র অভিবাসন এই বিষয়গুলি এবারের 'পিজিএ' তে জোরালোভাবে আলোচিত হয়েছে। 'পিজিএ' তে গৃহীত সুপারিশগুলি পরবর্তীতে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধির মাধ্যমে 'জিএফএমডি' তে উপস্থাপন করা হয়েছে। এবারের 'পিজিএ'তে গৃহীত অভিবাসন সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য সুপারিশ সমূহ হলো (১) শ্রম অভিবাসীদের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় নৈতিকতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। সুতরাং, সকল দ্বি-পাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক চুক্তিরভিত্তি হবে নৈতিক নিয়োগ প্রক্রিয়া। (২) শ্রমমান নির্ধারণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে অভিবাসন সংক্রান্ত

আন্তর্জাতিক আইনগুলো মেনে চলতে হবে এবং এই আইনগুলোর যথাযথ বাস্তবায়নের স্বার্থে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিকভাবে নাগরিক সমাজের সাথে এক হয়ে কাজ করতে হবে। তবে উল্লেখ্য যে, দ্বিপাক্ষিক ব্যবস্থাপনার চাইতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বহুপাক্ষিক শ্রম মান নির্ধারন শ্রমিকের জন্য অধিক মঙ্গল বয়ে আনে। (৩) সাম্প্রতিক কিছু ঘটনাবলি শ্রম অভিবাসী, শরনার্থী, এবং জলবায়ু অভিবাসীদের মধ্যে পার্থক্য টানা অসম্ভব করে তুলেছে। সুতরাং রাষ্ট্রকে সকল ধরনের অভিবাসীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। (৪) জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট অভিবাসনের ঝুকি মোকাবিলায় অভিবাসনের সকল পর্যায়ে জলবায়ু বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তিটির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। (৫) অভিবাসীদের প্রতি বৈষম্যমূলক ও বর্ণবাদী আচরণ পরিত্যাগ করতে হবে এবং এই সংক্রান্ত সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। (৬) আন্তঃ-রাষ্ট্রীয় সীমান্তে আটকে পড়া অভিবাসীদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রকে জাতিসংঘের নীতিমালা মেনে চলতে হবে। আন্তঃ-রাষ্ট্রীয় সীমান্তে আটকে পড়া সকল ধরণের অভিবাসীদের জন্য সীমান্ত খুলে দিতে হবে। বিশেষ করে সন্তান সম্ভাব্য মা বা শিশুর জন্য ইমিগ্রেশন ডিটেনশন বন্ধ করতে হবে।

অভিবাসন সম্পর্কে নতুন জ্ঞান ২০১৬

১. অভিবাসন বেশি হয়- এমন গ্রামগুলোতে পরিচালিত রামরু'র সাম্প্রতিক এক জন-গণনা জরীপে দেখা যাচ্ছে, মোট গৃহস্থালির ৩৩ শতাংশেই কোনো না কোনো সদস্য অভিবাসী। এই জরীপেই প্রথমবারের মতো দেখা যাচ্ছে - ফিরে আসা অভিবাসীদের আনুমানিক হার বা সংখ্যা। জরীপ এলাকায় দেখা গেছে, ২৭ শতাংশ গৃহস্থালির অভিবাসী সদস্য বিদেশ থেকে ফিরে এসেছে এবং বাকী ৭৩ শতাংশ বর্তমানে বিদেশে রয়েছে।

২. অভিবাসী ও অভিবাসী পরিবারগুলোর সন্তানদের উপর পরিচালিত রামরু-আরপিসি গবেষণা হতে দেখা যায় যে, ছেলে সন্তানেরা বড় হয়ে সরকারি চাকুরীতে অংশগ্রহণ করতে চায়, তা না হলে তারা চাকুরী নিয়ে বিদেশে যেতে চায়। মেয়ে সন্তানেরা লেখাপড়ায় আগ্রহী। কিন্তু পরিবারের অর্থনৈতিক শক্তি যা রেমিটেন্স হতে সৃষ্টি হয়েছে, তা ব্যবহার কওে তাদের অধিকাংশই ভাল ঘরে বিয়ে হোক-তা নিশ্চিত করতে চায়। এটা নিশ্চিত করার পাশাপাশি তারা আয় বৃদ্ধিকারী কর্মেও সাথে যুক্ত হতে চায়।

৩. বাংলাদেশ এবং শ্রমিক গ্রহণকারী দেশসমূহ নির্মাণ-শিল্পের কাজকে প্রাতিষ্ঠানিক খাত হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই খাতে শ্রমিক নিয়োগ এবং ব্যবস্থাপনার বিষয়টি অপ্রাতিষ্ঠানিক। অপ্রাতিষ্ঠানিকতা এই খাতের নিয়োগকর্তা এবং মধ্যস্থতাকারীদের এমন একটা সুযোগ তৈরি কওে দিচ্ছে যাতে করে তারা শ্রমিকদের কম বেতন দেয় এবং স্বাস্থ্য ও পেশাগত নিরাপত্তার বিষয়টি এড়িয়ে যেতে পারে। এছাড়াও তারা শ্রমিকদের যৌথ দরকষাকষি এবং দুর্ঘটনা ও কাজের কারণে মৃত্যুর মতো ঘটনায় ক্ষতিপুরণ দেওয়ার বিষয়গুলো নাকচ করতে পারে। ফলে, সরাসরি শ্রমিক নিয়োগের ব্যাপারে নিয়োগকর্তাদের সামান্যই আগ্রহ থাকে।

৪. পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে জলবায়ু পরিবতনের প্রভাবের ধরণ সমতল এলাকা থেকে ভিন্নতর। এ অঞ্চলের মানুষ বন উজাড় হওয়া, ভূমি-ধ্বস, অনাবৃষ্টি ও বন্যার মতো বিপদগুলো মোকাবেলা করে। এলাকার জনগণ নিজেদের মতো করে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এইসব পদক্ষেপগুলোর মধ্যে কর্মেও জন্য অভ্যন্তরীন অভিবাসন অন্যতম। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী জনগোষ্ঠআন্তর্জাতিক অভিবাসনে খব কমই অংশগ্রহণ করতে পারে। এই গবেষণা সুপারিশ করে যে, সরকারের বিভিন্ন জলবায়ূ পরিবর্তন কার্যক্রমে পাহাড়ী জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করতে হবে। আন্তর্জাতিক অভিবাসনকে তাদের অভিযোজনের অন্যতম একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।

৫. জিটুজি ব্যবস্থার মাধ্যমে মাধ্যমে মালয়েশিয়ায় শ্রমিক পাঠাতে না পারাটা সমুদ্র পথে অনিয়মিত অভিবাসনে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

৬. রামরু কর্তৃক আয়োজিত সোস্যাল এণ্ড ইকোনোমিক কস্ট অব মাইগ্রেশন বিষয়ক এক আলোচনা সভায় অভিবাসী ব্যক্তি ও অভিবাসী পরিবারের সদস্য এমন ২৯ জন ব্যক্তি তাদের বক্তব্যে বলেছেন, দক্ষিণ-পূর্ব ও মধ্য এশিয়ার দেশগুলোতে বাংলাদেশ থেকে এবং অন্যদেশ থেকে এসব দেশসমূহে অভিবাসন খরচের ব্যাপক ফারাক আছে। যেমন সিঙ্গাপুরে কাজ করতে যাওয়ার জন্য সর্বোচ্চ খরচ ১০,৮২৯ মার্কিন ডলার এবং এবং একই দেশে যাওয়ার সর্বনিম্ন খরচ ৭,৩২৫ মার্কিন ডলার। দুবাই ও লিবিয়া যাওয়ার সর্বোচ্চ খরচ ৭,০০৭ মার্কিন ডলার। অন্যদিকে সৌদি আরব ও ইরাক যাওয়ার সর্বোচ্চ খরচ যথাক্রমে ৬,১১৫ এবং ৫,৭৩৩ মার্কিন ডলার। আবুধাবি যাওয়ার ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন খরচ ৪৪৫ মার্কিন

ডলার। দু'জন নারী কর্মী সৌদি আরব গেছেন; যাঁদের একজন খরচ করেছেন ৬৩৭ এবং অপরজন ৮৯১ ডলার। এখানে দেখা যাচ্ছে, নারীদের জন্য অভিবাসনের গড় খরচ ৯১৩ মার্কিন ডলার এবং পুরুষদের গড় খরচ ৪,৮২৭ মার্কিন ডলার।

আবার এসব দেশে যাওয়ার জন্য বাংলাদেশিরা যে খরচ করেন, তা প্রতিবেশি দেশের নাগরিকদের থেকে বেশি। ২০১৬ সালে বাহরাইন যাওয়ার জন্য একজন বাংলাদেশি শ্রমিককে খরচ করতে হয় ২,৫০০ থেকে ৫,০০০ ডলার পর্যন্ত; যেখানে কেনিয়া, উগাণ্ডা এবং ঘানার শ্রমিকদের ব্যয় করতে হয় গড়ে ২৬৫ থেকে ৭৯৫ ডলার এবং ভারত ও শ্রীলঙ্কা সামান্যই খরচ করে। (সিদ্দিকী, ২০১৫)

সিঙ্গাপুর যাওয়ার জন্য বাংলাদেশি শ্রমিকদের গড় খরচ যেখানে ৫৫৬০ ডলার, সেখানে ফিলিপাইন ও ইন্দোনেশিয়ার শ্রমিকদের ব্যয় ২,৬৮০ ডলার আর ভারতীয়দের খরচ করতে হয় গড়ে ৩,৯০০ থেকে ৪,৭০০ মার্কিন ডলার পর্যন্ত। যাহোক, ২৫ জন ব্যক্তির ভাষ্য অনুযায়ী, তাদের গড় অভিবাসন খরচ ৩,৭৮০ মার্কিন ডলার এবং মাঝারি খরচ ৩,৮২২ মার্কিন ডলার। এসব অভিবাসীরা অনেক আগে বিদেশে গেলেও বর্তমান (২০১৫) অভিবাসন খরচ ৪,৮৬৭ মার্কিন ডলার। (সিদ্দিকী, ২০১৫)

উপসংহার

২০১৬ সালে অভিবাসন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্জন বেশ গভীর এবং ব্যাপক। দক্ষতার সাথে সরকার জিএফএমডি সম্মেলন সমাপ্ত করেছে। গ্লোবাল কমপ্যাক্টে শ্রম-অভিবাসনকে অন্তর্ভুক্ত করায় নেতৃত্ব দিয়েছে। নারী এবং পুরুষ উভয়ের অভিবাসন বেড়েছে ব্যাপকভাবে। সৌদি আরব এবং কুয়েতের মতো পুরনো শ্রম বাজোরে আমরা ভালভাবে পুন:প্রবেশ করতে পেরেছি। কিন্তু বেশ কিছু পুরোনো চ্যালেঞ্জ এখনো রয়ে গেছে। দীর্ঘ ৪০ বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও আমরা নিয়োগ প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ করতে পারিনি। দেশে এবং বিদেশে মধ্যস্বত্বভোগীর দৌরাত্ম কমাতে পারিনি। মালয়েশিয়া এবং ইউএইতে অভিবাসন এখনো আশানুরূপ নয়। এসব বাজারের বাইরে নতুন কোনো শ্রম বাজার বিকশিত হয়নি। অনিয়মিত অভিবাসন আমরা আজও সীমিত করতে পারিনি, অভিবাসীদের সেবাদান কার্যক্রম আজো বিকেন্দ্রীকরণ করা সম্ভব হয়নি, ডেমো অফিসগুলোর যে ধরনের ক্ষমতায়ন প্রয়োজন, তা আজ ঘটছে না। পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী যেমন পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী এবং অন্যান্য নৃ-জনগোষ্ঠী আজও আন্তর্জাতিক অভিবাসনের সুযোগ হতে বঞ্চিত। রেমিটেন্স প্রবাহে যে ধরনের হ্রাস পরিলক্ষিত হচ্ছে, তা আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে দীর্ঘদিনের যে রেমিটেন্স ডিভিডেন্ট তা কমিয়ে দিতে পারে। তবে এসব চ্যালেঞ্জের অনেকগুলোই মেকাবেলাযোগ্য। আমরা আশা করবো ২০১৭ সালে দেশের ভেতরকার চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলায় সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি সরকার হাতে নেবে।